পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০)
Movement of East Bengal and Rise of Nationalism (1947-1970)

ইউনিট ১

ভূমিকা : দীর্ঘ দু'শো বছর ইংরেজ শাসন ও শোষণের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের মধ্যে দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রদেশটির নাম ছিল পূর্ববাংলা। তবে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হলে এর নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের মূল অংশ পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য এ অঞ্চলের জনমনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ফলে শুরু থেকেই স্বাধিকারের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনগণকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন।

মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। সারা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠে। রক্তের বিনিময়ে পূর্ব বাংলা অর্জন করে ভাষার অধিকার। এরই পথ ধরে দানা বাঁধে ছয় দফা ও এগার দফার আন্দোলন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে। এর মধ্যে দিয়ে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: ভাষা আন্দোলনের পটভূমি
পাঠ-১.২: ভাষা আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ
পাঠ-১.৩: যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও এর ফলাফল
পাঠ-১.৪: পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ও আইয়ুব খানের শাসনকাল
পাঠ-১.৫: পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য
পাঠ-১.৬: ছয় দফা আন্দোলন
পাঠ-১.৭: ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

পাঠ-১.১ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি
Background of Language Movement

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভাষা আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান ছিল। কিন্তু এত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় একহাজার মাইলের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই উর্দু বনাম বাংলা নিয়ে ভাষা বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময়ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভাষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু তখন এই বিষয়টি ততটা প্রকট আকার ধারণ করেনি। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন। সেই সময়ে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বিরোধিতায় তা সফল হয়নি। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের সময় এই বিতর্ক আবার শুরু হয়। এরপর ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের পক্ষে মত দেন। ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখক, বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলার পক্ষে বক্তব্য দেন।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তমদ্দুন মজলিস সভা-সমিতি ও লেখনীর মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। স্বাধীনতা লাভের এক মাস পর ৬-৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলার তরুণ-যুবক রাজনৈতিক কর্মীদল তাদের ভবিষ্যত রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য যুব সম্মেলনের মাধ্যমে গঠন করে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। গণতান্ত্রিক যুবলীগের সম্মেলনে দাবি করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা হতে হবে বাংলা। ১৫ সেপ্টেম্বর এই সংগঠনটি 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাতে কর্ণপাত করেনি। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তারা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানায়। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার ব্যাপারে চাপ দিতে থাকে। ক্রমে ভাষার প্রশ্ন রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নূরুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে তমদ্দুন মজলিস 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী

ফজলুর রহমান আশ্বাস দেন যে, মানি অর্ডার, ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি-উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় লেখা হবে। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্যে হতে 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্যদের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এই সংবাদ ঢাকায় পৌছুলে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। শুরু হয়ে যায় একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। হরতাল চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অনেকে গ্রেফতার হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্র সমাজের প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। আন্দোলন তীব্রতর হলে খাজা নাজিমুদ্দীন ১৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮দফা চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন। কিন্তু ৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদের বিরোধী দলের প্রতিবাদের ফলে প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপিত হলেও বাস্তবায়ন হয়নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কঠোর নীতি

পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে সংগ্রাম পরিষদের স্বাক্ষরিত ৮ দফা চুক্তি সাধারণ ছাত্রদের খুশি করতে পারেনি। ফলে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দুই এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। আন্দোলনকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তখনও ছাত্ররা 'না না' বলে এর প্রতিবাদ করে।

সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কর্মসূচি

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। এই সময়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আকরাম খানকে সভাপতি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদে সভাসমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন বলতে কেবল ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে বুঝায় না। ভাষা আন্দোলনের একটি দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, রাজনীতিক ও একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অবস্থান নিলেও পূর্ব বাংলার রাজনীতিক, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সবাই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার পক্ষে প্রথম এগিয়ে আসে —

(ক) সাংস্কৃতিক সংসদ (খ) তমুদ্দুন মজলিশ

(গ) পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (ঘ) বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

২। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেছিলেন —

(ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (খ) খাজা নাজিমউদ্দীন

(গ) শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (ঘ) চৌধুরী খালেকুজ্জামান

৩। ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে —

(ক) গণতান্ত্রিক যুবলীগ (খ) তমুদ্দুন মজলিশ

(গ) মুসলিম লীগ (ঘ) সাংস্কৃতিক সংসদ

পাঠ-১.২ ভাষা আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ
Language Movement and Development of Bengali Nationalism

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- একুশে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত আন্দোলন বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	একুশে ফেব্রুয়ারি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন

খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনিও জিন্নাহর মতো ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সংগ্রাম পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার এ আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আন্দোলন দমন করার জন্য ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর মাধ্যমে ঢাকায় যে কোন প্রকার সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা সরকারি এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সভা করে তারা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আবদুল মতিন, অলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে জোরলো মত দেন। অবশেষে সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বর) ছাত্রদের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে যোগ দেয়। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিকেলে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভার দিকে প্রতিবাদ মিছিল অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার এবং আহত হন কয়েকজন ছাত্রীসহ অনেকে। সে সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার খবর শহরে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। শহরের চারদিক থেকে জনতার স্রোত এসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট চার্জ করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন। অনেকে গ্রেফতার

হন। যে স্থানে ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেই মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্ররা ২২ ফেব্রুয়ারি সারারাত জেগে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি শহিদ শফিউরের পিতাকে দিয়ে শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করা হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়।

২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফুলার রোডে একজন কিশোর নিহত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ডা. সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে রাতে মেডিকেল কলেজের গেইটের সামনে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি তা উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ১৯৭২ সালে পূর্বের নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনারটি নির্মাণ করা হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ২১ শে ফেব্রুয়ারি মিছিলে গুলি করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' এবং তরুণ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ 'স্মৃতির মিনার' শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। হাসান হাফিজুর রহমানের 'একুশের সংকলন' ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি', সঙ্গীতশিল্পী আবদুল লতিফে রচনা ও সুরে 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' এবং বাগেরহাটের চারণ কবি শামসুদ্দিন আহমেদ রচনা করেন 'তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি' শীর্ষক গান। ড. মুনীর চৌধুরী জেলে বসে রচনা করেন 'কবর' নাটক এবং জহির রায়হান রচনা করেন 'আরেক ফাল্গুন' শীর্ষক উপন্যাস। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত এসব কবিতা, গান, নাটক ও উপন্যাস বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রথমত: ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত গণ আন্দোলন। এটি শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠেনি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বাঙালিরা বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

দ্বিতীয়ত: ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত: ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনগণের মানসিকতা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটির শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এর পর আর কোন নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয়নি।

চতুর্থত: ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহিদ দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালে সংবিধানে তা বহাল থাকে।

পঞ্চমত: যুক্তফ্রন্ট পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য তুলে ধরে, যা ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের ছয় দফায় পরিস্ফুটিত হয়। স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।

ষষ্ঠত: ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি দান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলন সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। পাকিস্তানের প্রতি মানুষের মনে যে মোহ ছিল তা ধীরে ধীরে কেটে যায়। বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়ের জন্য রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্দি করে। ভাষা কেন্দ্রীক এই ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি রচনা করে। এটিই পরবর্তীকালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ সময় পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজ জীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ কোন সহানুভূতি পায়নি। তাই তাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে সংঘবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে বুকের রক্ত দিয়ে। এই ঘটনা পূর্ববাংলার জনগণের মনের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলনে একুশের চেতনা সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

(ক) নূরুল আমীন (খ) খাজা নাজিমুদ্দিন

(গ) লিয়াকত আলী খান (ঘ) শের-ই-বাংলা এ.কে ফজলুল হক

২। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' কার রচনা?

(ক) মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী (খ) আবদুল গাফফার চৌধুরী

(গ) হাসান হাফিজুর রহমান (ঘ) আলাউদ্দিন আল আজাদ

৩। সাংবিধানিকভাবে বাংলা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায় কত সালে?

(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৩ সালে

(গ) ১৯৫৬ সালে (ঘ) ১৯৫৮ সালে

পাঠ-১.৩ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও এর ফলাফল
United Front Election and its Result

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কীভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন ছিল 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে এই সময়ে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-প্রজা পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারের প্রতি মুসলিম লীগ কোন সম্মান দেখায়নি। তাই তাদের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের কোন আস্থা ছিল না। মুসলিম লীগ সরকার বার বার নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষের চাপের মুখে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড় রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো ছিল–মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার করা হয় ২১ দফা। ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ। যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসা জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা

৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দূর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। বাঙালিরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে মুসলিম লীগ খুব ভীত হয়ে পড়ে। এবার সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে এই বিজয়ের ফলাফলকে বানচাল করা যায়।

মন্ত্রিসভা গঠন

যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। মে মাসে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। শেরে বাংলা এবং যুক্তফ্রন্ট

মন্ত্রিসভার সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে থাকেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ভালভাবে গ্রহণ করেনি। শুরু থেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় বক্তৃতা দেয়ার সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন। তাঁর এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ পেয়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে। মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে।

এই সময়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারী করেন। ঐদিনই বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমানবন্দরেই গ্রেফতার করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন। পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি ছিল ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক) যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার একটি সারণি প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিশাল মাইলফলক। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর, বৈষম্য, অবহেলা এবং ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এ অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলে যুক্তফ্রন্ট সরকার খুব বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হয়েছিল —
(ক) ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মার্চ (খ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল
(গ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে (ঘ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন

২। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে —
(ক) ৩০৯টি আসন (খ) ২২৩ টি আসন
(গ) ২৭টি আসন (ঘ) ১৩৬টি আসন

৩। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় —
(ক) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে (খ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর
(গ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল (ঘ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে

পাঠ-১.৪ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ও আইয়ুব খানের শাসনকাল
First Constitution of Pakistan and Regime of Ayub Khan

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান জারি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।
- আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলীর বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, সামরিক শাসন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩৫ সালের আইন ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা নতুন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ হয় এবং কমিটির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হয়। মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়। ১৯৫৫ সালে গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান চালু ছিল মাত্র দু বছর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। সংবিধান স্থগিত করার সাথে সাথে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

সামরিক শাসন জারি

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। সংবিধান বাতিল, আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী উপরোক্ত কার্যক্রমে প্রধান সহযোগী ছিলেন আইয়ুব খান। উচ্চাভিলাষী আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি কঠোর হস্তে দূর্নীতি দমন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে 'পোডো' (Public Office Disqualification Order, PODO) এবং 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order, EBDO) নামক দুটি আদেশ জারী করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে একটি

নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করা হয়। আইয়ুব খান ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরগুলো ছিল : ১. ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), ২. থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়) এবং তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ। এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরণের সদস্য থাকতেন। এরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন

পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পূর্ব-পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। গণতন্ত্র পূনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকার গ্রেপ্তার নির্যাতন চালালে ছাত্র গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণরের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্ণর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালান। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১০ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। ৮ জুন সামরিক আইন স্থগিত করে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন

১৯৬০- এর দশকের শুরুতে আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দলবিধি' প্রবর্তন করে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের পূনরুজ্জীবন ঘটান। আইয়ুব খান নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী দল সক্রিয় হয়। এসময়ে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এই ফ্রন্ট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পূনরুজ্জীবন ও পূর্নগঠন করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলন পরিচালিত হয়।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৬৪ সালের শুরুতে আওয়ামী লীগ এনডিএফ থেকে বেরিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party, COP) নামে একটি জোট গঠন করে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহকে সহজেই পরাজিত করে দ্বিতীয় বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অবৈধ প্রভাব ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করেই আইয়ুব খান মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা পাক-ভারত যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সৈনিকদের তীব্র প্রতিরোধ, বাঙালি সৈন্যদের অসম সাহসিকতা ও নৈপুন্যে ভারতের লাহোর দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবল ভাবে জাগ্রত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক) বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে ৫টি বাক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার বিরোধী কার্যকলাপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র গণ আন্দোলনের সূচনা করে। নানা রকম কূটকৌশল ও দমন নীপিড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তা আইয়ুবের শাসন ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পূর্ব বাংলার 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করা হয় —
(ক) ১৯৪৭ সালে (খ) ১৯৫০ সালে
(গ) ১৯৫৪ সালে (ঘ) ১৯৫৬ সালে

২। মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন —
(ক) ইস্কান্দর মির্জা (খ) মাওলানা ভাষানী
(গ) আইয়ুব খান (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩। পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান রচিত হয় —
(ক) ১৯৫৬ সালে (খ) ১৯৫৮ সালে
(গ) ১৯৬০ সালে (ঘ) ১৯৬২ সালে

পাঠ-১.৫ পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য
Discrimination of West Pakistan towards East Bengal

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তান শাসকরা কীভাবে পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ কতটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শোষণ, বৈষম্য।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ব বাংলাকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় যার সফল পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ

পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানি শাসকবর্গ প্রথম থেকেই বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে। দুটি অঞ্চল সমান সম্পদের অধিকারি ছিল না। পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সমৃদ্ধ। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেখানে কৃষির কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ অঞ্চল আর্থিক দিক থেকে ছিল দুর্বল। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় রপ্তানি পণ্য হিসেবে পাট, চা ও চামড়ার যোগান ছিল বেশি। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে এদেশের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। ফলে ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চাকুরি ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের চিত্র কিছুটা আলোচনা করা হলো-

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গভর্ণর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

সামাজিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। সরকারের অর্থনৈতিক এবং পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম থেকেই বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে দু'ধরণের সমাজ জীবন পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরদের জীবন যাপন উন্নতমানের হলেও পূর্ব বাংলার

মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যেও দামের পার্থক্য থাকতো যাতে তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেবার জন্য অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য ছিল। ক্ষমতার শীর্ষে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তাদের এই বৈষম্যমূলক নীতি সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত বাঙালি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশ এই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। পূর্ববাংলা ছিল সম্পদশালী। পুরো পাকিস্তানের আয়ের ৬০ ভাগ আয় হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হতে। অথচ এ অঞ্চলে এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় করা হতো। আর বাকি সব নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ যেত পূর্বপাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানকে আমদানি দ্রব্যের মাত্র ২৫ ভাগ দেয়া হতো। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগের বসবাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় করা হতো এ অঞ্চলের জন্য। পাকিস্তানের অর্থ ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়েছে পূর্ববাংলার সম্পদে। কিন্তু এ দেশের উন্নয়নের দিকে কোন নজর দেয়া হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং এ আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাঙালিরা সুস্পষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের ১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩ টিই অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ফলে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেখানে প্রায় বিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা চাকুরির প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির নিয়োগ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিজেদের মত করে নীতি নির্ধারণ করা সহজ হতো। দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর সকল পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রধান দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে দেয়াই হতো না। এ ছাড়াও মনোনয়ন বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হতেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এসব কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পক্ষে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া ছিল খুব কঠিন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ। এদের ভাষা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অন্যদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৫ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরণের। এদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে বাঙালিদের পাকিস্তানিকরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই বৈষম্য

বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। তাই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ এবং পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ববাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যতদিন পর্যন্ত এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়নি ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেনি। কিন্তু ক্রমে পাকিস্তানিদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কয়েকটি পর্যায়ে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়–

প্রথমত: পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রতিবাদ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে নিয়ে। ৫৫% লোকের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায়। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে মুসলীম লীগকে পরাজিত করা হয়। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়।

তৃতীয়ত: ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির বিরুদ্ধে বাঙালিরা আবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সংবিধানের বিরুদ্ধে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন ক্রমে শিক্ষা রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে ছয় দফাভিত্তিক, আগরতলা মামলা বিরোধী সর্বোপরি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের মধ্য দিয়ে বৈষম্য বিরোধী প্রতিক্রিয়া সফল হয়।

চতুর্থত: পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ছিল ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

পঞ্চমত: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাঙালির রায় ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। যদিও বাঙালি জাতিকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ববাংলা সমান সুযোগ ও সম্মান পায়নি। বরং তারা পূর্ববাংলাকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ববাংলা। অবশেষে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পূর্ববাংলার জন্য পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয় থেকে ব্যয় করা হতো —
(ক) ষাট ভাগ (খ) সাতাশ ভাগ (গ) পঁচিশ ভাগ (ঘ) পনেরো ভাগ

২। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ববাংলায় শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে —
(ক) কম ছিল (খ) সমান ছিল (গ) কাছাকাছি ছিল (ঘ) বেশি ছিল

৩. পাকিস্তানি আমলে বাঙালিদের উচ্চপদে নিয়োগ পাওয়া —
(ক) সহজ ছিল (খ) স্বাভাবিক ছিল (গ) কঠিন ছিল (ঘ) একটি সাধারণ বিষয় ছিল

পাঠ-১.৬ ছয়-দফা আন্দোলন
Six Points Movement

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছয় দফা দাবি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ছয়-দফা, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় সরকার, আঞ্চলিক সরকার ইত্যাদি।

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে বাঙালিকে মুক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় দল ছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় এগিয়ে এলেন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ নিয়ে। এই সনদটি ছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা।

বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। বিরোধী দলের সম্মেলন চলাকালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু সম্মেলন বর্জন করে সাংবাদিক সম্মেলন করে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে ঢাকায় চলে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ছয় দফাতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবী। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২. শুধুমাত্র দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে। অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. আঞ্চলিক সরকারে হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসেব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ছয় দফা ঘোষিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে নতুন আশার আলো দেখা দেয়। দিন দিন ছয় দফার কর্মসূচি জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আইয়ুব খানের সরকার প্রচার করতে থাকে যে, ছয় দফা হচ্ছে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন। তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য দমন

নীতি প্রয়োগ করতে থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুরু হয় হয়রানি ও নির্যাতন। ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়। এতে আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে প্রতিবাদী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। আওয়ামী লীগ পালন করে প্রতিবাদ দিবস। নেতাদের মুক্তির দাবিতে ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মানুষ মিছিল বের করে। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী ও তেজগাঁও শিল্প এলাকায় পুলিশের গুলিতে মনু মিয়াসহ ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

ছয় দফার গুরুত্ব

ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পর্যায় শুরু হয়। তাই ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ছয়দফার প্রতিটি দফাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ কারণে একে বাঙালির বাঁচার দাবি বলা হয়েছে।

১. **শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর :** পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘকাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছিল ছয় দফা কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে 'বাংলার কৃষক, মজুর, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনসাধারণের মুক্তির সনদ এবং বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি এটিকে বাঁচার দাবি ৬দফা বলে উল্লেখ করেন।

২. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ :** ছয় দফা ছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ কারণে ছয় দফার প্রতি জনগণের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ছয় দফা আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের ফলে নবজাগ্রত চেতনাবোধ বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। এর ফলে স্বায়ত্বশাসন দাবি জোরদার হয়।

৩. **আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি :** ছয় দফা ভিত্তিক দাবিগুলো ছিল বাঙালির প্রাণের দাবি, তাই এ দলটি ৬৬ সালের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৪. **স্বায়ত্তশাসনের দাবি :** ছয় দফার মধ্যে দিয়েই পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে অধিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দাবি করা হয়েছিল।

৫. **১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রভাব :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কর্মসূচিতে ছয় দফা অন্তর্ভূক্ত করায় এ দলটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

৬. **মুক্তিযুদ্ধে প্রভাব :** ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হয়। ৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাঙালির স্বাত্তসাশনের বিষয়টি সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়। এভাবে ছয় দফা বাঙালিকে মুক্তির প্রেরণা দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি সারণিতে ছয় দফা দাবিগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

ছয় দফাকে বলা হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ। ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্ব শাসন, অর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির নির্দেশনা ছিল। ছয় দফার ভিত্তিতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এর মধ্য দিয়েই ত্বরান্বিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় —
(ক) ঢাকায় (খ) লাহোরে (গ) আগরতলায় (ঘ) ইসলামাবাদে

২। ছয় দফা অনুযায়ী কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা ছিল কার হাতে?
(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে (খ) আঞ্চলিক সরকারের হাতে
(গ) উভয় সরকারের হাতে (ঘ) বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে

পাঠ-১.৭ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
Historical Agartola Case and Mass Procession Upsurge of 1969

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ৬৯-এর ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আগরতলা মামলা, গণঅভ্যুত্থান।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। ফলে ছয় দফার আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য সরকার এবার নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে সরকার পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়। সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভিযুক্তরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ কারণে মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম ছিলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। এটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। শেখ মুজিব তখন জেলখানায় বন্দী। ১৯৬৬ সালের ৮ মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরও ৩৪ জনকে এই মামলার আসামী করা হয়।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরল গণসংবর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করা হয়। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

এগার দফা আন্দোলন

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভূক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবার একসাথে আন্দোলনে নামে। আইয়ুব খানের পতনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। তাদের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর দশকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের গণভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোন আস্থা ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতম হচ্ছিল। আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েও আন্দোলন থামাতে পারেনি।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি মিলে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট অংশ মিছিল করে গভর্ণর হাউস ঘেরাও করলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে ৮ ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১দফা দাবি পেশ করে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক একটি মোর্চা গঠন করে ৮ দফা দাবি পেশ করে। এরপর 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে।

'ডাক' এর আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘটে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা।

পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল থেকে সরকারী পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান* ও সরকার সমর্থক *দৈনিক মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিকশা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়। আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুসংখ্যক মানুষ নিহত ও আহত হন।

গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবস্থা বেগতিক দেখে বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু অটল থাকেন। গোলটেবিলের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০ জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে সরিয়ে দিয়ে ড. এম এন হুদাকে নতুন গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তাতেও গণআন্দোলন শান্ত হয়নি। তখন তিনি ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এরফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

গণ অভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তার সাফল্যজনক পরিণতি আইয়ুব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির যে জাতীয়তাবোধ ১৯৪৮ সালে সৃষ্টি হয় তা পূর্ণতা পায় ঊনসত্তর সালের এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ৬৯- এর গণ অভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	৬৯- এর গণ অভুত্থানের প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করে শেখ মুজিবসহ অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনের মুখে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। তবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এতে থেমে যায়নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্ররা উত্থাপন করে এগার দফা দাবি। আইয়ুব খানের দমন নীতি, শোষণ নিপিড়ন, নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারি প্রশাসন। গণ আন্দোলন গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। গণ অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করা হয় —
(ক) ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে (খ) মে ১৯৬৬ সালে (গ) জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে (ঘ) মার্চ ১৯৬৭ সালে

২। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন —
(ক) তোফায়েল আহমেদ (খ) শেখ মুজিবুর রহমান (গ) সার্জেন্ট জহুরুল হক (ঘ) কিশোর মতিউর

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১	ঃ	১। খ	২। ক	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৫	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৬	ঃ	১। খ	২। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৭	ঃ	১। গ	২। ক		
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। ঘ	৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্ন

১) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

প্রীতি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্কুলে "ভাষা আন্দোলন" এর উপর রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রস্তুতি নিতে গিয়ে সে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারল। রাতে সে তার বাবার সাথে আলোচনা করে নিজের প্রস্তুতিকে আরেকটু শানিয়ে নিল। এখন সে রচনা লেখার বিষয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী।

(ক) 'তমুদ্দিন মজলিস' গঠিত হয়েছিল কত সালে? ১
(খ) 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর প্রধান কর্মসূচি কী ছিল? ২
(গ) ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলনের বিবরণ দিন। ৩
(ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৪

২) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

অনিক একদিন টিভি দেখছিল। একটি অনুষ্ঠান তার খুব ভালো লাগল। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে তথ্যবহুল সচিত্র আলোচনা হচ্ছিল। এ অনুষ্ঠান থেকে অনিক পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য, ছয়দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারল।

(ক) ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা হয়েছিল কত সালে? ১
(খ) ছয়দফার প্রধান দাবিগুলো কী ছিল? ২
(গ) পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের বিবরণ দিন। ৩
(ঘ) উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৪